রশীদ জামীল

যেদিনও বসন্ত ছিল

সেদিনও বসন্ত ছিল

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

উৎসর্গ

দিবা

আমার মাকে যে 'মা' ডাকার অধিকার পেয়েছে। যার আবেগের সঙ্গে বিবেকের দ্বন্দ্ব লেগে থাকে হরহামেশা। কখনো জয়ী হয় আবেগ, কখনো বিবেক। আমি দূরে বসে দেখি। দেখতে মন্দ লাগে না।

মিসবাহ

আমার ইমিডিয়েট অনুজ। শক্ত করে একটা ধমক দিলেই কেঁদে ফেলার কৃতিত্ব দেখাতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে মহা উৎসাহে আবারও সেই কর্মটির দিকে নজর দেয়, যে জন্য ধমক দেওয়া হয়েছিল।

এদের উভয়ের মধ্যে যেসব ইস্যুতে সব সময় সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়, তার অন্যতম হলো, তরকারি ঠান্ডা-গরম সমস্যা। প্রার্থনা করি, তরকারি যেন আজীবন গরমই থাকে।

প্রকাশকের কথা

সেদিনও বসন্ত ছিল বইটি উপন্যাস। পড়লে ভালো লাগবে। ফাঁকে ফাঁকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানাও যাবে। প্রথম প্রকাশ ছিল ২০১০। এর পর আর ছাপা হয়নি; কোথাও পাওয়া যেত না। কিন্তু বইটি পড়তে উদ্‌গ্রীব ছিলেন অনেকেই। পুনরায় প্রকাশের জন্য কয়েক বছর ধরে অনেকে বিভিন্নভাবে অনুরোধ করছিলেন। লেখকের তরে অনুরোধগুলো পৌঁছে দিই। প্রকাশে সম্মতি দেন। নিজেও আরেকবার ঘষামাজা করে দেন। আমরাও নির্ভুল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

তাহলে এবার শুরু হোক বইয়ের পাঠ...

আবুল কালাম আজাদ
১ জুলাই ২০২১

ভূমিকা

২০১০ খ্রিষ্টাব্দ। তখন ব্লগে লিখতাম। *প্রথম আলো ব্লগ* ছিল আমাদের অনলাইন-লেখালেখির ঠিকানা। একঝাঁক লেখকের আড্ডাস্থল ছিল ব্লগপাড়া। আমি লিখতাম আমার মতো। আমার মতো মানে যা খুশি আর যেমন খুশি। বন্ধুরা উপন্যাস লিখতে জেঁকে ধরল; আমি উপন্যাস লিখলে ভালো কিছু হবে। তাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করতে আমার প্রথম প্রয়াস *সেদিনও বসন্ত ছিল*।

ঠিক ১১ বছর পর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে কালান্তর প্রকাশনী উপন্যাসটি নতুন করে প্রকাশ করছে। কালান্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

রশীদ জামীল

২০ জুন, ২০২১

সেদিনও বসন্ত ছিল

রশীদ জামীল

বুড়িগঙ্গার ঠিক মধ্যখানে খোলা নৌকায় দাঁড়িয়ে আছে কম্পাস। হাতে পাসপোর্ট। আমেরিকাগামী ফ্লাইটের রি-কনফার্ম করা টিকেট। সকাল ১০টায় কম্পাসের ফ্লাইট। ৯ : ৩৭ বাজে। তাহলে কম্পাস এখানে কেন?

আবার কেমন জানি অ্যাবনরমাল মনে হচ্ছে তাকে। উশকোখুশকো চুল, পরনে মলিন কাপড়, উদাস চেহারা। পা দুটি কাঁপছে। দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে পাসপোর্ট-ভিসা নদীতে ফেলে দিতে পারে। নিজেও ঝাঁপ দিয়ে দেয় কি না কে জানে!

কম্পাসের বন্ধু নোমান হিসাব মেলাতে পারছে না। কম্পাস এমন এক ক্যারেক্টার, যে কিনা কোনো কারণ ছাড়াই একনাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসতে পারে। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'আরে ব্যাটা! জীবন আর কদিনের রে? যখন যা হওয়ার, তা তো হবেই। অযথা এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে টেনশন বাড়িয়ে লাভ কী?'

নোমানের ধারণা, কেউ যদি হঠাৎ এসে কম্পাসকে খবর দেয়, 'এই কিছুক্ষণ আগে রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে তোমার বাবা দুটি পা-ই ভেঙে ফেলেছেন! তিনি এখন পঙ্গু হাসপাতালের...' তাহলে কথা শেষ করতে না দিয়েই সে বলবে, 'ও আচ্ছা, তাই নাকি? তারপর দোস্ত, তোর কী খবর বল। আজকাল তোকে দেখাই যায় না, ব্যাপার কী রে?'

এই হলো কম্পাস। সমস্যা ও দুশ্চিন্তা, এ দুটি শব্দের সঙ্গে যার কোনোই সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব বক্তব্যও আছে, যার সারসংক্ষেপ হলো,

'মানুষ তখনই দুশ্চিন্তা করে, যখন সে কোনো সমস্যায় পড়ে। সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য দুশ্চিন্তা শুরু করে। ফলে ব্রেইনের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে গোবলেট পাকিয়ে ফেলে। তাই ব্রেইন ফ্রি থাকে না। তখন ওই মস্তিষ্ক

দ্বারা স্বচ্ছভাবে চিন্তাও করতে পারে না। এ জন্য যেকোনো সমস্যা সমাধানের প্রথম শর্ত হলো, সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করা। তাহলে মস্তিষ্ক চাপমুক্ত অবস্থায় ফ্রেশ থেকে সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে।'

সমস্যার সৃষ্টি হলে দুশ্চিন্তাকে তো আর দাওয়াত করে আনতে হয় না। এমনি এমনিই চলে আসে। তাহলে দুশ্চিন্তা ব্যাপারটি দূরে রাখা যাবে কেমন করে—এ ব্যাপারেও বেশ জোরালো যুক্তি রয়েছে কম্পাসের ঝুলিতে। তার ভাষায়,

'সমস্যা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আসতে পারে। তবে সমস্যা যা-ই আসুক এবং যেভাবেই আসুক, তার সবচেয়ে খারাপ পরিণতির জন্য মানসিক প্রস্তুতি সেরে নিন। Be Prepeard for worst situation। দেখবেন, সমস্যা আপনার ভেতর কোনো দুশ্চিন্তার জন্ম দিতে পারছে না।

আপনি অসুস্থ হয়েছেন? সেটাও একটা সমস্যা। এই সমস্যা নিয়েও আপনার দুশ্চিন্তা হবে। এবারে আপনি একটি কাজ করতে পারেন। অসুস্থতার চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে যান। মনে মনে ভাবুন, মরেই গেলাম। মৃত্যুই যদি কপালে লেখা থাকে, তাহলে সেটা তো আমি মুছে ফেলতে পারব না। তাহলে খামাখা চিন্তা করার দরকার কী? দেখবেন, অসুস্থতা নিয়ে আপনার ভেতর কোনো দুশ্চিন্তা কাজ করছে না।

অতএব, হাসুন মন খোলে। হাসি আবার হার্টের জন্যও উপকারী।'

এই হলো কম্পাস। সদা হাস্যোজ্জ্বল এক তরুণ। কম্পাস ও নোমান খুবই কাছের বন্ধু। একই প্রতিষ্ঠানে তারা চাকরি করত। সেই থেকে সম্পর্ক, যা ধীরে ধীরে বন্ধুত্বে রূপ নেয়। সেই বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তাদের উভয়ের মধ্যে প্রাইভেসি নামক কোনো দেয়াল থাকেনি। একজন অন্যজনের চোখের দিকে তাকিয়েই পেটের ভেতরের কথা বুঝে নিতে পারে। অথচ আজ...

আজ নোমান বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে বুড়িগঙ্গার পাড়ে। বিব্রত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে নদীর মধ্যখানে পাসপোর্ট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কম্পাসের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে এখন কী করবে; সে কি আরেকটি নৌকা নিয়ে চলে যাবে তার কাছে? কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে বলবে, 'কী হয়েছে দোস্ত? তুই এখন এখানে এই অবস্থায় কেন? আমাকে বল। আমি সবকিছু ঠিক করে দেবো।'

এরই মধ্যে হঠাৎ...

পাঠক, এর পরের ঘটনা জানতে হলে কম্পাসের জীবনের গল্প জানতে হবে। সময় ও ধৈর্য থাকলে চলুন আমার সঙ্গে, কম্পাসের জীবনের গল্পে প্রবেশ করি।

অবশ্য কারও যদি এত ধৈর্য না থাকে, তাহলেও সমস্যা নেই। শর্টকাট একটি বুদ্ধি বাতলে দিচ্ছি। ডট (...) চিহ্নগুলোর পরে ধাক্কা মেরে কম্পাসকে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিন। মনকে একটু শক্ত করতে পারলে ওকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলুন। খেল খতম, কাহিনি শেষ।

কম্পাস, ২৪ ছুঁইছুঁই টগবগে তরুণ। তারুণ্যের দ্বীপ্তি ছড়াচ্ছে তার অবয়বে; অথচ একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে কৈশোরিক চাঞ্চল্যের দুরন্ত আভা এখনো বিদায় নেয়নি তার থেকে।

কম্পাসের জন্ম হয় হাসপাতালে। হাসপাতাল-ক্লিনিকের ওপর খুব একটা ভরসা নেই কম্পাসের বাবা আমানুল্লাহ কবিরের। কিন্তু স্ত্রীর ব্যথাতুর মুখের দিকে তাকিয়ে এবং বিকল্প পথ খুঁজে না পেয়ে স্ত্রীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভর্তি করলেন একটি বেসরকারি ক্লিনিকে। বেসরকারি এই ক্লিনিকটির নাম 'মানবসেবা ক্লিনিক'। হাসপাতালের মতো সারি সারি করে বেড পাতা। অল্পবয়সি নাক উঁচু স্বভাবের নার্স মেয়েরা সাদা অ্যাপ্রোন পরে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করছে। রিসিপশনে বসে আছে ২৬/২৭ বছরের এক মেয়ে। কেউ তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বলছে, 'হাই স্যার! হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?' তার ইংলিশ প্রনাউনসিয়েশনের দুরবস্থা দেখেই বোঝা যায়, বাক্যটি মুখস্থ করতে তার কম করে হলেও তিন সপ্তাহ লেগেছে!

আমানুল্লাহর ধারণা, দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ দেশের সরকারি-বেসরকারি সব হাসপাতাল/ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবার মান ভয়াবহ পর্যায়ের। জীবনে তিনি অনেক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। চিকিৎসা ও চিকিৎসক-সংক্রান্ত যে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তার পেটে জমা হয়ে রয়েছে, সেগুলো তিনি ফলাও করে প্রকাশও করতে পারছেন না। এর কারণ, খুব পয়সাওয়ালা না হওয়ায় কেউ তাকে সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানায় না, যেখানে তিনি কথাগুলো বলতে পারতেন। বিকল্প হলো 'কলাম' আকারে লিখে কোনো জাতীয় বা স্থানীয় পত্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া নতুবা বই আকারে প্রকাশ করা। এটাও সম্ভব হচ্ছে না। প্রথমত দেশের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী বড় পত্রিকাগুলো লেখার ওজনের চেয়ে লেখকের ওজনকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। আর তিনি ওজনদার কেউ নন। নামের পেছনে ব্যবহার করার মতো তেমন কোনো ডিগ্রি নেই তার।